বিশেষ সাক্ষাৎকার ▷ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

৬ শতাংশ থেকে এই বছরই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে নেওয়া সম্ভব

গত ৩০ জুন জাতীয় সংসদে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঙ্কের বাজেট এটি। বড় অঙ্কের এই বাজেটে বিশাল ঘাটতি যেমন আছে, তেমনি বড় অঙ্কের রাজস্ব আয়ের কথাও বলা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেট কতটা বাস্তবসম্মত, বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কতখানি সম্ভব, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কেন একই বৃত্তে আটকে আছে—এমন আরো অনেক প্রশ্নে কালের কণ্ঠের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর **ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শেখ শাফায়াত হোসেন**

কালের কণ্ঠ : বাজেটে অর্থমন্ত্রী ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ৩৮ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার প্রাক্কলন করেছেন। ব্যাংকগুলোতে এখন পর্যাপ্ত তারল্য থাকলেও সুদের হার কমতে থাকায় তারল্যও কমতে পারে। সে ক্ষেত্রে সরকারের নেওয়া ঋণ বেসরকারি খাতের ঋণপ্রাপ্তিতে চাপ তৈরি করবে কি?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : প্রথমত বলব, এবার চমৎকার একটি বাজেট হয়েছে। দেশি শিল্প বিকাশের প্রচুর সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রশ্ন যেটা করেছেন, সেটা বহু দিনের আলোচিত বিষয়। কয়েক বছর যাবৎ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ প্রতিবছর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ করে বাড়ছে। সুদের হারের তারতম্য হলে আমানত ব্যাপকভাবে কমে যাবে, তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। বিনিয়োগযোগ্য তহবিল আসতেই থাকবে। প্রশ্ন হলো, সরকার যদি ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করে, তাহলে ব্যক্তি খাতে প্রভাব পড়বে কি না। প্রভাব পড়তেই পারে। এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যাবে না। খুব সংগতভাবেই, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ যদি বাড়ে (যেটা বাড়া উচিত কিন্তু কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না), তখন সরকার হয়তো অন্য কোনোভাবে ঘাটতি পূরণ করবে।

প্রথম কথা হলো, সরকারের বিদেশি ঋণের পাইপলাইনটা বেশ বড়, প্রায় দুই হাজার কোটি ডলার। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এটাকে ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, রাজস্ব আহরণ যদি বাড়ে তাহলে ঘাটতি কম হতে পারে। তাহলে কিন্তু বেসরকারি খাতে চাপ পড়বে না।

তবে বেসরকারি বিনিয়োগে চাপ পড়ে, সরকারের এমন ঋণ না নেওয়াই ভালো। সরকারের আরো অনেক সুযোগ আছে ঋণ নেওয়ার। যেমন জনগণের কাছ থেকে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঋণ নেওয়া। এর মুনাফা কমানো ও কর আরোপের বিষয়ে সরকারের আরেকটু চিন্তা করা ভালো ছিল। কারণ যারা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করে, তারা মধ্যবিত্ত, অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমধ্যবিত্ত, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা স্থির আয়ের মানুষ। তারা যদি একটু বেশি মুনাফা পায় তাতে অনেক পরিবার একটু ভালোভাবে চলতে পারে। সরকারের এই সুদব্যয় কিন্তু ভালো কাজে লাগছে।

কালের কণ্ঠ : অনেক অর্থনীতি বিশ্লেষকের মতে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার কারণে সুদ পরিশোধে ব্যয় অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এবারও সুদ পরিশোধে বাজেটের ১১.৯ শতাংশ বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণ কি আগামীতে অনেক বেশি চাপ তৈরি করবে?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : তাহলে তো আমাদের চলে যেতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ বাজেটে। যেখানে কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট তো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হয় না। যে দেশে দারিদ্র্য আছে, বেকারত্ব আছে। জীবনযাত্রার মান উন্নতির দিকে যাচ্ছে (আরো বেশি যাওয়া উচিত), সেখানে তো ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট করা যাবে না, ঘাটতি বাজেটই করতে হবে।

তবে হ্যাঁ, একটি উপায় ছিল পুঁজিবাজার, এটা যদি একটি বড় উৎস হতে পারত, তাহলে হয়তো ওগুলো অনেকটাই বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হয়ে এটা চলে যেত। এত ঘাটতি হয়তো হতো না। কিন্তু ঘাটতি হলে যদি সেটা জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া যায়, এর ফলে যদি সুদব্যয় কিছুটা বাড়ে তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই। কারণ অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ তো দেশের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। বরং বিদেশি ঋণের সুদ বিদেশি মুদ্রায় বিদেশে চলে যায়।

কালের কণ্ঠ : নতুন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য করপোরেট করের হার ৪২.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সমাজের একটি অংশ নতুন ব্যাংক তথা ব্যাংক শাখা খোলার বিরোধিতা করে। কিন্তু আমরা এর জোরদার প্রবক্তা, কারণ এতে সেবার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। প্রতিযোগিতা বাড়বে। সেখানে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাঁড়ানোর জন্য যদি একটুখানি ছাড় দেওয়া যায়, সেটাকে খারাপ মনে করি না। সাড়ে ৪২ থেকে কমিয়ে ৪০ করেছে। এটা তো তেমন কিছুই না।

কালের কণ্ঠ : জনপ্রশাসনে মোট ব্যয় মোট বাজেটের ১৯.২ শতাংশ। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ মিলছে না বলে মন্ত্রীরাই অভিযোগ করছেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের তুলনায় জনপ্রশাসনের ব্যয় কি যুক্তিযুক্ত?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : জনপ্রশাসনে যে পর্যন্ত ব্যয় ২৫ শতাংশে না উঠছে, ততক্ষণ এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এ জন্য যে জনপ্রশাসন হলো সবচেয়ে বড় অবকাঠামো। একটি দক্ষ, সৎ ও চৌকস জনপ্রশাসন উন্নয়নের কাজকে গতি দেয়। কাজেই জনপ্রশাসনকে ঠিক করার জন্য, স্বচ্ছ করার জন্য একটু বেশি ব্যয় হওয়াটা অপচয় নয়। তবে এ খাতে যেটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ততটা খরচ হবে না। কেননা নতুন পে স্কেল এখনই পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে না। ধাপে ধাপে হবে। এ বছর জনপ্রশাসনে ১৭ শতাংশের বেশি ব্যয় হবে না।

আর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে আরো বেশি বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। সাধারণ একটা নিয়ম হলো শিক্ষা খাতে জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) ৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা। কিন্তু আমাদের শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ২ শতাংশের নিচে চলে গেছে। এটাতে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

কালের কণ্ঠ : দুই লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকার বাজেটে এক লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা এনবিআরের মাধ্যমে আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে বলে কি আপনার মনে হয়?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : এটা অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য। শুধু তাই নয়, ইদানীং দেশের অর্থনীতি যেহেতু বেশ বলিষ্ঠভাবে প্রবৃদ্ধি লাভ করছে, সেহেতু রাজস্ব আহরণেও গতি আসবে, এটা ক্রমেই বাড়বে। গত দুই মাসে কিন্তু সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। কাজেই রাজস্ব আদায়ের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। কোনো অসুবিধা দেখি না।

তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি, দেশের ১০ শতাংশ মানুষের হাতে ৩৭ ভাগ আয় ও সম্পদ রয়েছে। এরা সংখ্যায় ৪০ লাখ পরিবার। অথচ আয়কর দেয় মাত্র ১০ লাখ পরিবার। এদের কাছ থেকে যদি সঠিকভাবে কর আদায় করা যায় তবে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। তবে এই কর আদায়ে ব্যর্থতার দায় কর প্রশাসনেরও। সবাই মিলে যদি তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা যায় তাহলে এক লাখ ৭৬ হাজার কোটি কেন, তিন লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। ক্রমান্বয়ে সেদিকেই যেতে হবে।

কালের কণ্ঠ : বাজেটে প্রতিবারই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়ে, কিন্তু বাস্তবায়ন সে মাত্রায় বাড়ে না। তা ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থ ব্যয়ে যত তাগিদ থাকে মন্ত্রণালয়গুলোর, কাজের মান নিশ্চিত করার দিকে ততটা গুরুত্ব থাকে না। এখান থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এর থেকে বের হতে হবে। বের হওয়ার উপায় আছে। প্রথমত, এডিপির মধ্যে প্রতিবছরই ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বরাদ্দ থাকে পুরনো প্রকল্পে। ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এবং রাজনৈতিক প্রভাবে চলে আসছে। এসব প্রকল্পে গরিব মানুষের তেমন কোনো উপকার হয় না। কাজেই প্রথম কাজ হবে একটি বস্তুনিষ্ঠ ম্যাকানিজমের মাধ্যমে পুরনো, অকেজো, জনসাধারণের জন্য কল্যাণমূলক নয়, এমন প্রকল্প বাদ দিয়ে এডিপির আকার ছোট করা। আর অবকাঠামোসহ মেগা প্রকল্পগুলো নজরদারি বাড়িয়ে বাস্তবায়ন করা।

দ্বিতীয়ত, একসময় কার্যকর ছিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং পার্টি। প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা গুচ্ছ মন্ত্রণালয়ের জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়দ্বয়ের সমন্বয়ে একটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং পার্টি করা হতো, কোন প্রকল্পে কোথায় কী ত্রুটি আছে সেগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করা হতো।

তৃতীয়ত, আমরা মনে করি, মালয়েশিয়া ও মিসরের আদলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সবচেয়ে বড় ২০টি প্রকল্পের একটি চিত্র থাকা দরকার। যেখান থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে একটা পর্যালোচনা করবেন। কোন প্রকল্প কোথায় আটকে আছে, দেখবেন এবং সে অনুযায়ী দিকনির্দেশনা দেবেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ও পারদর্শী। তিনি নির্দেশনা দিলে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন আরো সহজ ও সফল হবে।

> বাজেটে বেশ কিছু ইতিবাচক উপাদান আছে। তবে তার মধ্যে কিছু উপাদানের ঘাটতি আছে। থাকলে ভালো হতো। প্রথমত কী কারণে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হচ্ছে না, সেটা আমাদের দেখা দরকার। একটা হলো জিডিপি বাড়ছে, প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে। তবে সেটা ৬ শতাংশের বেশি যেতে পারছে না। বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত যেভাবে বাড়ার দরকার ছিল তার থেকে কম বাড়ছে। অর্থনীতি যদি আরো সক্ষম হয় তবে ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও কমে যাবে

চতুর্থত, আমাদের দেশে আইএমইডি (ইনফরশেমন মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন) কেবল আর্থিক বরাদ্দ কতটুকু হয়েছে ততটুকুই দেখে। কিন্তু আসল মূল্যায়ন হলো আর্থিক বরাদ্দের সঙ্গে কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা। ওইখানে যদি তদারকি করা যায় তবে অবশ্যই প্রকল্পের বাস্তবায়ন বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চমত, আর্থিক বছর জুলাই-জুনের পরিবর্তে জানুয়ারি-ডিসেম্বর করা হলে অপচয় দুর্নীতি কমবে, দক্ষতা বাড়বে।

কালের কণ্ঠ : বাংলাদেশ অনেক বছর ধরেই জিডিপির প্রবৃদ্ধির ৬ শতাংশের বৃত্তে আটকে আছে। এটিকে ৭ শতাংশের ওপরে নিতে পাস হওয়া বাজেট কি যথেষ্ট?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : বাজেটে বেশ কিছু ইতিবাচক উপাদান আছে। তবে তার মধ্যে কিছু উপাদানের ঘাটতি আছে। থাকলে ভালো হতো। প্রথমত কী কারণে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হচ্ছে না, সেটা আমাদের দেখা দরকার। একটা হলো জিডিপি বাড়ছে, প্রবৃদ্ধিও হচ্ছে। তবে সেটা ৬ শতাংশের বেশি যেতে পারছে না। বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত যেভাবে বাড়ার দরকার ছিল তার থেকে কম বাড়ছে। অর্থনীতি যদি আরো সক্ষম হয় তবে ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও কমে যাবে। যদি তা কমে তাহলে সমপরিমাণ বিনিয়োগ থেকে বেশি প্রবৃদ্ধি আসবে। সেখানে সুশাসন দরকার হবে, দক্ষতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতি কমানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তাহলে বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত যদি বাড়ে, ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও যদি কিছুটা কমে যায় তাহলে এক-দেড় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি কোনো বিষয় না। দুর্নীতি কমলে জিডিপি কিছুটা বাড়বে। তবে বিনিয়োগ কেন বাড়ছে না সে সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাণিজ্য বেশি লাভজনক হলে শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ কম হতেই পারে।

অর্থমন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেছেন, ব্যাংকব্যবস্থায় নানা ধরনের দুর্নীতি রয়েছে। রাঘব বোয়ালদের ধরা যায় না। বর্তমানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে যদি ২০০৩ সালে শুরু হওয়া অবসায়িত ঋণের পরিমাণ যোগ করা হয়, তবে এটা হবে ৯১ হাজার কোটি টাকা। ২০০১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে খেলাপি ঋণ ছিল ২০ হাজার কোটি টাকা। নব্বইয়ের দশকে শেখ হাসিনার সরকারের সময় খেলাপিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, ঋণখেলাপিকে সামাজিক সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ৫৭টি মামলা করা হয়েছিল। খ্যাতনামা অনেক আইনজ্ঞও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। মামলায় হেরে খুবই প্রভাবশালী অনেক পরিচালককে তাঁদের পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। খেলাপিদের বিরুদ্ধে এখনো একইভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঋণ অবসায়নে নৈতিকতার স্খলন হয়। সাধারণ আমানতকারীদের টাকা খাটিয়ে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। সেই মুনাফার একটি অংশ প্রভিশন করে বড়লোকদের খেয়ালখুশিমতো খেলাপি ঋণ অবলোপন করা হয়। এই জিনিসটা পুনরায় খতিয়ে দেখা দরকার।

কালের কণ্ঠ : পাবলিকলি ট্রেডেট কম্পানির করপোরেট করের হার কিছুটা কমানো হয়েছে। বাংলাদেশের করপোরেট কর হার ও আদায় নিয়ে আপনার মতামত কী?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : পাবলিকলি ট্রেডেট কম্পানি অর্থাৎ বেসরকারি করপোরেট খাতের যেসব কম্পানি নিবন্ধিত, অর্থাৎ লিস্টেড কম্পানি—এই লিস্টেড কম্পানি ও নন-লিস্টেড কম্পানির মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা দরকার, যাতে নন-লিস্টেড কম্পানি লিস্টেড হতে উৎসাহিত হয়।

বিএসইসির নতুন আইনে একজন শেয়ারগ্রহীতাকে পরিচালক হতে গেলে কমপক্ষে মূলধনের ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ করতে হয়। এই আইনটা লাগসই নয়। কেননা একটা বড় কম্পানির ২ শতাংশ শেয়ার তো অনেক বেশি। কাজেই এটাকে কমিয়ে যদি যুক্তিসংগত পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়, তাহলে অনেক লোক কিন্তু বিনিয়োগ করবে। বিনিয়োগ তো শুধু লাভের জন্য করে না। পরিচালক হয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্যও অনেকে তা করে। কাজেই মূলধন বাজারে আগ্রহী বিনিয়োগ সৃষ্টির মানসে একটি কম্পানিতে আরো কম ইক্যুয়িটি খাটিয়ে পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা দেওয়া যায় কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

কালের কণ্ঠ : ইউরোর দরপতনে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যের তারতম্য থাকে। একটা সাধারণ স্কিম নেওয়া যেতে পারে যে মুদ্রা বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে কোনো উদ্যোক্তা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে তাঁর ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থা করা। অনেক দেশে এমন বিধান আছে।

এই সুযোগে আমি দুটো কথা বলব। বর্তমানে আমাদের যে বিনিময় নীতি, সেটা খুব একটা বিনিয়োগসহায়ক নয়। কারণ টাকার মূল্য বাড়ছে। রিজার্ভ বাড়ছে, এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু রিজার্ভ বাড়া মানে যদি টাকার মান বাড়া হয় তবে তাতে কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানি পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এটা হলে প্রতিযোগী দেশগুলো সুবিধা পায়। ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া এই চারটি দেশ কিন্তু সজ্ঞানে তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে তাদের রপ্তানি মূল্য কমিয়েছে। এতে তাদের রপ্তানি বাড়বে আর আমাদের রপ্তানি তেমন বাড়বে না।

যদি টাকার মূল্যমান বাড়ে তবে রেমিট্যান্সের ওপরও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ একজন প্রবাসী যদি তাঁর স্বজনকে ৮০ টাকা পাঠাতে চান তবে আগে তাঁকে এক ডলার পাঠালে হতো। কিন্তু এখন যেহেতু এক ডলারে ৭৮ টাকা পাওয়া যায় সেহেতু ৮০ টাকা পাঠাতে হলে এক ডলারের বেশি রেমিট করতে হবে।

কালের কণ্ঠ : বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২৫ বিলিয়ন ডলার। এটা সরকারের জন্য স্বস্তিদায়ক। অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক কোনো দিক কি আছে?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : প্রশ্ন হলো এটা কেন এত বেশি বেশি জমছে। কারণ বিনিয়োগ তেমন হচ্ছে না। বিনিয়োগ বেশি হলে আমদানি বেশি হবে। আর বেশি আমদানি হলে আমদানি ব্যয়ও বেশি হবে। রিজার্ভ তেমন স্ফীত না।

দেখতে হবে কী কারণে বিনিয়োগ হচ্ছে না। এটা কি শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হচ্ছে না? আমি মনে করি না যে রাজনৈতিক অস্থিরতাই একমাত্র কারণ। এখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তেমন কিছু নেই। ওই যে বললাম, বিনিময় নীতি, অতিরিক্ত সংকোচনশীল মুদ্রানীতি এসব কারণেও হয়তো বিনিয়োগ হচ্ছে না। বুঝলাম, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিন্তু এখন তো মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। একসময় ১১ শতাংশে চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এনেছে। কিন্তু এখন মুদ্রানীতিকে সম্প্রসারণ করতে হবে। বিনিয়োগ হবে, আমদানি বাড়বে। পরে রপ্তানিও বাড়বে। রিজার্ভ যেহেতু বেশি আছে সেটাও কাজে লাগবে।

রিজার্ভটা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। গ্যাসের মজুদ কমে আসছে বলে শোনা যায়। এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যয় করে গ্যাস মজুদ ও উত্তোলন বিষয়ে বিনিয়োগ করা উচিত।

এ দেশের উন্নয়নের একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ। এই যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনসিংহ—এগুলোকে যত দ্রুত পারা যায় চার লেন করে ফেলা দরকার। রেলওয়েতেও আরো বিনিয়োগ করতে হবে। ব্রডগেজে যেতে হবে। ডাবল লাইন করতে হবে সব বড় কেন্দ্রের সঙ্গে, এবং নিরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু করতে হবে। নৌপথেও বিনিয়োগ করতে হবে।

কালের কণ্ঠ : বিদেশি বিনিয়োগে বাংলাদেশের সম্ভাবনা থাকলেও পর্যাপ্ত হারে তা আসছে না। এর পেছনে মূল কারণগুলো কী বলে আপনার মনে হয়?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : এটা খুব বড় প্রশ্ন। পৃথিবীতে এফডিআই হলো এক হাজার ৮০০ কোটি বিলিয়ন ডলার, আমরা পাই এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার। ভারত, ভিয়েতনাম, চীন অনেক পায়। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আপনি যদি কাগজ-কলমে দেখেন, সেখানে বিনিয়োগের পরিবেশ খুবই ভালো। ভালো মানে আসলেই ভালো। তবু এফডিআই আসছে না।

একটা কারণ কিছুটা রাজনৈতিক কানাঘুষা। তা ছাড়া টিআইবি, সিপিডি, বড় দুটো পত্রিকার নেতিবাচক প্রচারণা তো আছেই। তবে বিনিয়োগ বোর্ডকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করা দরকার। আইনি শক্তিশালী, অর্থায়নে শক্তিশালী, জনবলে শক্তিশালী করা দরকার। তবেই এ দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। সবচেয়ে চৌকস কর্মকর্তাদের এখানে দেওয়া দরকার। বিনিয়োগ বোর্ডের ক্ষমতাও বাড়ানো দরকার। বিনিয়োগ বোর্ডে পাঁচ কর্মদিবসের ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। কোরিয়ান ইপিজেডের বিষয়টা ২৩ বছর ধরে ঝুলে আছে। জমির সীমাবদ্ধতা তো আছে। এ ক্ষেত্রে তাদের যে যে সুবিধা দিয়ে রাখা যায় রাখতে হবে। গ্যাস ও বিদ্যুতের বরাদ্দের সীমিত ক্ষমতা বিনিয়োগ বোর্ডের হাতে দেওয়া দরকার।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিষয়ে বিধিমালা গত চার বছরেও প্রণয়ন করা গেল না কেন?

কালের কণ্ঠ : প্রায়ই সরকারের নীতিনির্ধারকরা বলছেন যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগের পরিমাণ কম। বাকি অর্থ কি পাচার হচ্ছে? বিনিয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া পাচার ঠেকানোর আর কোনো কার্যকর পথ আছে কি?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : এটা তো মনে হচ্ছে আপনি আমার প্রশ্নই করলেন। আমরা বলছি যে দেশে রেফ্রিজারেটরের নামে ১০-১৫ কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে আসে, ধরা তো তখন পড়ে যখন পরতায় পড়ে না। এটা বন্ধ করা যায়, প্রশাসনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সাম্প্রতিককালের হিসাবগুলোতে অর্থপাচার ও সুইস ব্যাংকে ক্রমবর্ধমান আমানত প্রমাণ করে যে নজরদারিব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

কালের কণ্ঠ : অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় ২০১৬ সালের জুলাই থেকে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। সব খাতে সমান হারে ভ্যাট আরোপ হলে এটা পণ্যের দামের ওপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে বলে আপনার মনে হয়?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সাধারণভাবে একটা নীতি হলো, আইন যত সহজ হবে, যত ইউনিফর্ম হবে, তত ভালো হবে। তত তাকে কার্যকর করা যাবে। এই তিনটা-চারটা-পাঁচটা রেট না করে একটা রেট করা ভালো। আমি অর্থমন্ত্রীকে সাধুবাদ দিই।

আমি বাজেট নিয়ে আলোচনায় বলেছি, কত খাতে ভ্যাট আদায় হয় না। এর মধ্যে একটা হলো মিষ্টির দোকান, অন্যটি হলো ওষুধ। অনলাইনে বেচাকেনায় কর আদায় হয় কি?

কালের কণ্ঠ : ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশ সড়ক, রেল ও নৌপথে সংযুক্ত হওয়ার পথে এগোচ্ছে। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের বর্তমান অবস্থায় এটা সম্ভব কি? দেশগুলোর সঙ্গে আন্তযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে যে বিপুল বিনিয়োগ দরকার, তার উৎস কী হতে পারে?

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : যোগাযোগ উন্নয়নের একটি বড় চাবি। এই চাবি কিন্তু খুলল। বাজার যত বড় হবে, যোগাযোগ যত দ্রুত হবে, তত উন্নয়নের গতি বাড়বে। ভারত আমাদের আগে ১০০ কোটি টাকার একটি ঋণ দিয়েছে। আবার আরো একটি ১০০ কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছে। এই টাকা যদি যোগাযোগ খাতে খরচ করি, এরপর তাদের সঙ্গে দেনদরবার করি যে দেখো, এটাতে আমাদের যেমন লাভ হচ্ছে, তোমাদেরও হচ্ছে। আমাদের চেয়ে হয়তো তোমাদের লাভ বেশি হচ্ছে। খুব সম্ভব তাদের রাজি করানো যাবে যে ঋণটাকে মঞ্জুরিতে রূপান্তর করাতে। অর্থের কিন্তু খুব একটা অভাব হবে না। আমাদের রিজার্ভ কিন্তু পড়ে আছে। এগুলো দিয়ে যদি অবকাঠামোটা বাড়াই, অনেক লোকে আজেবাজে কথা বলে, আমরা বিনা পয়সায় ট্রানজিট দিয়ে দিচ্ছি। তিস্তা দিয়ে যখন পানি গড়াবে, ইলিশ মাছ তখন সাঁতরে ওই পারে চলে যাবে। বাংলাদেশ এখন অনেক পরিপক্ক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দুই বছর আগে একটা কথা বলেছিলেন, ট্রানজিট যদি দেওয়া যায়, সেটা আবার বন্ধও করা যায়। কাজেই কোমর শক্ত করতে হবে। এখন অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের ওপর প্রতিবেশীদের অনেক নির্ভরতাও আছে। এই যে রাস্তাটা খুলে গেল, আগে শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশ সব সময় বলত, দ্বিপক্ষীয়, এখন কিন্তু বহুপক্ষীয় হয়ে গেছে। এখন যদি মিয়ানমারের মধ্যে দিয়ে চীনের সঙ্গে যোগাযোগটা হয়ে যায় ও চতুর্দেশীয় যোগাযোগটা যদি সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে। বন্দরের আয়ও অনেক বাড়বে। অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রগতির একটা গতিবেগ আছে। এই গতিবেগটা আরো বাড়াতে হবে। ৬ শতাংশ থেকে এই বছরই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে নেওয়া সম্ভব এবং আগামী চার বছরে এটাকে ৯ শতাংশে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

কালের কণ্ঠ : সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।